Journal of Journalism and Media (2025), Vol. 7, No. 1, pp. 83-103

লালসালু চলচ্চিত্রঃ সহজিয়া ও রক্ষণশীল ইসলামের দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ

মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন
জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

সার-সংক্ষেপ
তানভীর মোকাম্মেল পরিচালিত *লালসালু* (২০০১) চলচ্চিত্রটি বাংলার গ্রামীণ সমাজে সহজিয়া ও রক্ষণশীল ইসলামের মধ্যকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে একটি গভীর সমাজতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পাঠ হিসেবে উপস্থাপন করে। চলচ্চিত্রটি ধর্মকে কেবল আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ক্ষেত্র হিসেবে নয়, বরং ক্ষমতা, সংস্কৃতি ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এক কার্যকর কাঠামো হিসেবে নির্মাণ করে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল চলচ্চিত্রে সহজিয়া ও রক্ষণশীল ইসলামের সাংস্কৃতিক উপস্থাপন, চরিত্র নির্মাণ, বয়ান ও ভিজ্যুয়াল ভাষার মাধ্যমে ধর্মীয় মতাদর্শের দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ করা। গবেষণাটি গুণগত পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে চলচ্চিত্র বিশ্লেষণে তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আন্তোনিও গ্রামসির 'সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ তত্ত্ব' ও স্টুয়ার্ট হলের 'রিপ্রেজেন্টেশন তত্ত্ব'। এই দুই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে চলচ্চিত্রে ধর্মীয় কর্তৃত্ব, জনগণের সম্মতি নির্মাণ ও সংস্কৃতির মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, মজিদ চরিত্রটি ধর্মীয় কর্তৃত্বের প্রতীক, যিনি ভয়, ধর্মীয় ভাষা ও কর্তৃত্বের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ওপর সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার বিপরীতে, গ্রামীণ বিশ্বাস ও লোকাচার, যেমন: শিলারী আচার, বাউল গান ও কৃষিভিত্তিক লোকসংস্কৃতি সহজিয়া ইসলামের মানবিক, সহিষ্ণু ও লোকজ চেতনার প্রতিনিধিত্ব করে, যা মজিদের দৃষ্টিতে 'বেদাতি' ও 'অধার্মিক' হিসেবে চিহ্নিত হয়। চলচ্চিত্রের ভিজ্যুয়াল বিন্যাস, বিশেষত ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল, আলো ও রঙের ব্যবহার-ধর্মীয় ক্ষমতার শ্রেণিবিন্যাস ও সাধারণ মানুষের অধীনতাকে দৃশ্যমান করে তোলে। সার্বিকভাবে, *লালসালু* বাংলার সমাজে মানবিক সহজিয়া ধর্মবোধ ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক রক্ষণশীল ইসলামের সংঘাতকে উন্মোচন করে এবং দেখায়, কীভাবে ধর্মীয় আধিপত্য সংস্কৃতি ও মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পুনরুৎপাদিত হয়।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: সহজিয়া ইসলাম, রক্ষণশীল ইসলাম, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ, রিপ্রেজেন্টেশন, ধর্মীয় কর্তৃত্ব, আধুনিকতা।

যোগাযোগঃ mosharrof379@stamforduniversity.edu.bd

ভূমিকা

বাংলার ইসলামি ঐতিহ্যকে একরৈখিক বা একমাত্রিক কোনো ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করে বোঝা সম্ভব নয়। বরং এটি একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল, যেখানে লোকায়ত সহজিয়া ইসলাম ও শরিয়ত-নির্ভর রক্ষণশীল ইসলামের ধারা সময়ের প্রবাহে সহাবস্থান, সংঘর্ষ ও পারস্পরিক প্রভাবের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে (Rahman, 2018; Dasgupta, 2004)। এই দ্বৈত বিকাশ বাংলার সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ককে বহুমাত্রিক করে তুলেছে।

বাংলার প্রেক্ষাপটে সহজিয়া ইসলাম মূলত একটি সংশ্লেষণধর্মী ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, যা স্থানীয় সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক চর্চার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সুফি রহস্যবাদ, বৈষ্ণব সহজিয়া ও বৌদ্ধ সাহজিয়া দর্শনের পাশাপাশি লোকবিশ্বাস, আচার ও জীবনদর্শনের সংমিশ্রণে এই ধারার নির্মাণ ঘটে (Haq & Brian, 2023; Dasgupta, 2004)। একাদশ শতাব্দীতে বাংলায় সুফি সাধকদের আগমন ও পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে তাঁদের ধারাবাহিক প্রচার কার্যক্রম ইসলামের একটি মানবিক, আধ্যাত্মিক ও সহজবোধ্য ব্যাখ্যাকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেয় (হক, ২০১১)। এই সুফি-প্রভাবিত ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসনের পরিবর্তে অভিজ্ঞতা, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে গুরুত্ব দেয়। ফলে ইসলাম এখানে কেবল ধর্মীয় বিধি-বিধানের কাঠামো হিসেবে নয়, বরং জনগণের সংস্কৃতি, মনোজগত ও দৈনন্দিন জীবনাচারের অংশে পরিণত হয়। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি 'সহজিয়া ইসলাম' বা 'জনপ্রিয় ইসলাম' হিসেবে স্বতন্ত্র পরিচিতি লাভ করে (নোমান, ২০২৪; হক, ২০১৭)।

এর বিপরীতে, রক্ষণশীল ইসলাম বাংলায় একটি শুদ্ধতাবাদী ও সংস্কারমুখী ধর্মীয় অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে। এই ধারার আদর্শিক ভিত্তি গড়ে ওঠে আরবের ওয়াহাবি আন্দোলন, ফরায়েজি সংস্কার এবং আধুনিক সালাফি ও দেওবন্দি মতাদর্শের প্রভাবে। রক্ষণশীল ইসলাম ধর্মীয় আচরণকে নির্দিষ্ট শরিয়তি মানদণ্ডে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় এবং স্থানীয় সংস্কৃতিসংশ্লিষ্ট ধর্মচর্চাকে বিচ্যুতি হিসেবে চিহ্নিত করে। ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকেই এই শরিয়তকেন্দ্রিক ইসলামি ভাবধারা সহজিয়া ও সুফি ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে (নোমান, ২০২৪)। বিশেষত, ১৮১৮ সালে হাজী শরীয়তউল্লাহর প্রত্যাবর্তনের পর ফরায়েজি আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলায় ওয়াহাবি-সালাফি মতাদর্শের সংগঠিত বিস্তার ঘটে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় ধর্মীয় আচারকে 'অ-ইসলামি' ঘোষণা করে তা পরিত্যাগে উৎসাহিত করা (খান, ২০০৭)।

বিংশ শতাব্দীতে ও স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে রক্ষণশীল ইসলামের সামাজিক প্রভাব ক্রমশ জোরদার হয়, যা সহজিয়া-সুফি ঐতিহ্যের সঙ্গে একটি স্থায়ী আদর্শিক দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়। এই দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে মাজার সংস্কৃতি,

পীর-ভক্তি ও লোকায়ত ধর্মীয় অনুশীলন। যেখানে সহজিয়া ও সুফি ধারায় এসব অনুশীলন আধ্যাত্মিক সাধনার অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেখানে রক্ষণশীল আলেম সমাজ এগুলোকে শিরক ও বিদআতের অভিযোগে প্রত্যাখ্যান করে (নোমান, ২০২৪; Hossain, 1995)। ফলে বাংলার ইসলামি পরিসরে ধর্মীয় অনুশীলন কেবল বিশ্বাসের বিষয় হিসেবে সীমিত থাকে না; বরং তা ক্ষমতা, সাংস্কৃতিক আধিপত্য ও মতাদর্শিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এই ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিকতাই বাংলার ইসলামি সংস্কৃতির জটিলতা ও বৈচিত্র্যতাকে গভীরভাবে নির্ধারণ করেছে।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার উপস্থাপন সমাজের বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটায়। তানভীর মোকাম্মেল পরিচালিত *লালসালু* (২০০১) চলচ্চিত্রটি এই প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, যেখানে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর একই নামের উপন্যাস (১৯৪৮) অবলম্বনে বাংলার গ্রামীণ সমাজে সহজিয়া আধ্যাত্মবাদ ও রক্ষণশীল ইসলামের সংঘাতকে বাস্তবভিত্তিকভাবে রূপায়ণ করা হয়েছে। বাংলার ইসলামি সংস্কৃতির ইতিহাসে সুফি-সহজিয়া ও শরিয়তি ইসলামের মধ্যে দ্বন্দ্ব একটি প্রাচীন ও ক্রমবিকাশমান সামাজিক বাস্তবতা। সাহিত্য ও ইতিহাসে এই সংঘাতের বিস্তর আলোচনা থাকলেও (Khalil, 2022; Mallick, 1977), চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এর শৈল্পিক উপস্থাপনা নিয়ে পর্যাপ্ত অ্যাকাডেমিক অনুসন্ধান তুলনামূলকভাবে সীমিত। এই প্রেক্ষাপটে *লালসালু* চলচ্চিত্রটি বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের একটি তাৎপর্যপূর্ণ সিনেমাটিক পাঠ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই গবেষণার লক্ষ্য হলো *লালসালু* চলচ্চিত্রে সহজিয়া ও রক্ষণশীল ইসলামের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা এবং এর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অনুধাবন করা। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে ধর্মীয় প্রতিনিধিত্ব বিশ্লেষণে একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনের পাশাপাশি চলচ্চিত্র অধ্যয়ন, ধর্মতত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক অধ্যয়নের আন্তঃবিভাগীয় সংযোগ আরো সুসংহত হবে।

সহজিয়া ইসলাম: বাংলার ধর্মীয় সিক্রেটিজম ও সুফি ঐতিহ্যের বিকাশ

বাংলা ভূখণ্ডে ইসলামের আগমন ও বিকাশ কোনো সরল বা একমাত্রিক ঐতিহাসিক ঘটনা নয়; বরং এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ফল। এই অঞ্চলে ইসলাম কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলার ইসলামি ঐতিহ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর সহজিয়া বা সিক্রেটিক চরিত্র, যেখানে সুফি রহস্যবাদ, স্থানীয় লোকবিশ্বাস, বৌদ্ধ সাহজিয়া দর্শন ও বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব পারস্পরিক সংমিশ্রণে একটি অনন্য ধর্মীয় ধারার জন্ম দিয়েছে। এই ধারাই বাংলার প্রেক্ষাপটে 'সহজিয়া ইসলাম' নামে পরিচিত, যা ইসলামের মানবিক ও

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকে বিশেষভাবে প্রতিফলিত করে (নোমান, ২০২৪; Rahman, 2018; Dasgupta, 2004)।

ঐতিহাসিকভাবে বাংলায় ইসলামের প্রাথমিক প্রবেশ ঘটে অষ্টম শতাব্দীতে আরব ও পারস্যের বণিকদের মাধ্যমে, যারা বাণিজ্যের পাশাপাশি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন করেন (Eton, 1993)। তবে এই পর্যায়ের ইসলাম মূলত সীমিত পরিসরেই বিস্তৃত ছিল। ইসলামের ব্যাপক সামাজিক বিস্তার সূচিত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের (১২০২-১২০৪) পর, যখন সুফি সাধক ও ইসলামি মিশনারিদের ধারাবাহিক আগমন ঘটে (হক, ২০১১)। এই সুফিরাই বাংলার সাধারণ জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। সুফি সাধকদের প্রচারিত ইসলামের প্রধান শক্তি নিহিত ছিল তাঁদের মানবিকতা, সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁরা ধর্ম প্রচারে রাজনৈতিক ক্ষমতা বা বলপ্রয়োগের পথ অবলম্বন না করে নৈতিক আদর্শ, প্রেম, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সমতার বাণীকে অগ্রাধিকার দেন (রইছউদ্দিন, ২০১৪)। বৌদ্ধ ও হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে দীর্ঘদিন অভ্যস্ত বাংলার জনগণের কাছে এই মানবিক ও অন্তর্মুখী ধর্মব্যাখ্যা সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। সুফি চিন্তায় শরিয়তের কঠোর অনুশাসনের তুলনায় মারেফত বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অধিক গুরুত্ব পায়, যা ইসলামের সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতির স্বাভাবিক সংমিশ্রণকে সম্ভব করে তোলে (নোমান, ২০২৪)। ফলে বাংলার ইসলামি সংস্কৃতি কখনোই আরবীয় বা পারসিক ইসলামি রীতির সরাসরি অনুকরণে গড়ে ওঠেনি। বরং স্থানীয় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সঙ্গে এক ধরনের সমন্বয়মূলক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে এটি বিকশিত হয়েছে। এই ধর্মীয় সিঙ্ক্রেটিজম বাংলায় একটি মানবতাবাদী ইসলামি ঐতিহ্যের ভিত্তি রচনা করে, যেখানে ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে মানবিক মূল্যবোধ অধিক গুরুত্ব পায়। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার ধর্মীয় জীবনে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই প্রেক্ষাপটে সুফি দরবেশদের খানকা ও মাজার সংস্কৃতি, বৈষ্ণবদের নামকীর্তন ও বৌদ্ধ সহজিয়াদের ধ্যানচর্চা একত্রে একটি অভিন্ন লোকধর্মীয় পরিসর নির্মাণে ভূমিকা রাখে (Rahman, 2018)। এই বহুমুখী ধারার সমন্বয়েই গড়ে ওঠে বাংলার সহজিয়া ইসলাম, যা শরিয়তি বিধি-নিষেধের পরিবর্তে মানবতা, প্রেম, সহমর্মিতা ও আধ্যাত্মিক আত্ম-উন্নয়নকে কেন্দ্র করে দাঁড়িয়ে আছে।

সহজিয়া ইসলামের প্রভাব বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। লোকসঙ্গীত, বাউল দর্শন, মাজারকেন্দ্রিক ধর্মচর্চা, কবিগান, পালাগান ও লোককাহিনীতে এই চিন্তাধারার গভীর ছাপ বিদ্যমান। বাউল সাধকদের শরীরকেন্দ্রিক আধ্যাত্মিক দর্শন এবং সুফি সাধকদের আত্মশুদ্ধি ও প্রেমভিত্তিক ঈশ্বর-অন্বেষণের

ধারণা একই মানবিক চেতনায় মিলিত হয়। বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার পরিবর্তে ত্যাগ, বৈরাগ্য ও অন্তর্লোকের সাধনাকেই তারা মুখ্য বলে বিবেচনা করেন (নোমান, ২০২৪)। এই উদার ও সমন্বয়বাদী সহজিয়া ইসলাম বাংলার ধর্মীয় সহাবস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি নির্মাণ করলেও ঔপনিবেশিক শাসন, আধুনিক ইসলামি সংস্কার আন্দোলন ও গোঁড়া শরিয়তপন্থী মতাদর্শের উত্থান এই ঐতিহ্যকে ক্রমশ চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে। তবু এসব চাপের মধ্যেও বাংলার লোকজ ইসলাম আজও সহজিয়া ভাবধারার অবশেষ বহন করে চলেছে (নোমান, ২০২৪)।

রক্ষণশীল ইসলামের উত্থান ও বৈশিষ্ট্য

বাংলায় রক্ষণশীল ইসলামের ভাবধারার বৌদ্ধিক ও মতাদর্শিক উৎস উনবিংশ শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপে সূচিত ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। এই আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব (১৭০৩-১৭৮৭), যার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ধর্মীয় সংস্কার ধারাটি ইতিহাসে 'ওয়াহাবিবাদ' নামে পরিচিতি লাভ করে (Siddiqi, 2018)। ওয়াহাবি চিন্তাধারার কেন্দ্রীয় বক্তব্য হলো, ধর্মীয় অনুশীলনে যেকোনো ধরনের বেদাত বা নতুন সংযোজন পরিহার করা এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের আচার-অনুশাসন অবিকৃতভাবে অনুসরণ করা। এই মতাদর্শে সুফিবাদকে ইসলামের প্রারম্ভিক ঐতিহ্যের বাইরের একটি পরবর্তী সংযোজন হিসেবে দেখা হয় এবং একে বেদাত বা নব-আবিষ্কৃত ধর্মনীতি হিসেবে প্রত্যাখ্যান করার পরামর্শ দেয়া হয় (খান, ২০০৭)। কোরআন ও হাদিসের সরাসরি ও আক্ষরিক অনুসরণ এবং সালাফে সালেহিনের জীবনাচরণে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান, এই দুই উপাদান ওয়াহাবি মতবাদের মৌলিক ভিত্তি গঠন করে। তাদের মতে, ইসলামের বিশুদ্ধ রূপ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য লোকজ প্রথা, আঞ্চলিক ধর্মাচার ও সুফিবাদী বিশ্বাসসমূহ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা আবশ্যক (নোমান, ২০২৪)।

বাংলায় রক্ষণশীল ইসলামের বিকাশ এই ওয়াহাবি পুনর্জাগরণ আন্দোলনের প্রভাবেই গভীরভাবে প্রোথিত হয়। এর প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশ হিসেবে উনবিংশ শতকের গোড়ায় সূচিত ফরায়েজি আন্দোলন (১৮১৮) বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। হাজী শরীয়তউল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) পরিচালিত এই আন্দোলন ছিল একটি সুস্পষ্ট ইসলামি সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনবাদী প্রচেষ্টা, যার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের অ-ইসলামি আচার ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করা এবং ফরজ ইবাদত যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে ধর্মীয় শুদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করা (Siddiqi, 2018)। ফরায়েজি আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল কঠোর একেশ্বরবাদের অনুসরণ, শিরক ও বিদাতের প্রতি শূন্য সহনশীলতা এবং লোকজ ও আচারভিত্তিক ধর্মীয় অনুশীলনের প্রত্যাখ্যান। জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুকেন্দ্রিক

বিভিন্ন সামাজিক আচার, ফাতেহা, মিলাদ, উরস, পীর-ভক্তি ও আশুরা উপলক্ষে তাজিয়া নির্মাণ, এগুলোকে এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ শিরক বা বিদাত হিসেবে নিন্দা করেন (Siddiqi, 2018; Hasan, 2011)। এই অবস্থান কার্যত বাংলার সহজিয়া ও সুফি ইসলামি ঐতিহ্যের সরাসরি বিরোধিতা করে, যা রক্ষণশীল ইসলামের মূল আদর্শিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে রক্ষণশীল ইসলামের বিস্তার আরও গতিশীল হয় আরব উপসাগরীয় দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাবের মাধ্যমে। ১৯৭০-এর দশক থেকে সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশ বিশ্বব্যাপী ইসলামি শিক্ষা ও দাওয়াহ কার্যক্রমে বিপুল অর্থায়ন শুরু করে, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলাদেশে সালাফি ও ওয়াহাবি মতাদর্শের প্রসারে প্রতিফলিত হয়। হজ্ব পালন শেষে প্রত্যাবর্তনকারী মুসলমান ও প্রবাসী কর্মজীবীরাও এই মতাদর্শের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন (Hasan, 2011)। রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও রক্ষণশীল ইসলামের সামাজিক বৈধতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৫ সালের পর জিয়াউর রহমান ও পরবর্তী সময়ে এরশাদ সরকারের আমলে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অপসারণ, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান ও ইসলামি শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মতো পদক্ষেপ রক্ষণশীল ইসলামের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করে তোলে (Siddiqi, 2018)। নব্বইয়ের দশক থেকে প্রায় সব রাজনৈতিক সরকারই ক্ষমতার স্বার্থে রক্ষণশীল গোষ্ঠীর সঙ্গে আপস ও সহযোগিতার পথ অবলম্বন করে।

এই প্রেক্ষাপটে ১৯৯০ ও ২০০০-এর দশকে হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ (হুজি-বি), আহলে হাদিস আন্দোলন এবং জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর মতো সংগঠনগুলো কোরআন ও হাদিসের আক্ষরিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ধর্মীয় অনুশাসন প্রচার করে। জেএমবি-র শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে ২০০১-২০০৬ মেয়াদের চারদলীয় জোট সরকারের রাজনৈতিক যোগাযোগের বিষয়টি গণমাধ্যমে আলোচিত হয়েছে (সুলতান, ২০১৬)। পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের (২০০৯-২০২৪) আমলেও কওমি মাদ্রাসাকেন্দ্রিক রক্ষণশীল শিক্ষাব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও প্রণোদনা প্রদান করা হয়। এর প্রতীকী দৃষ্টান্ত হিসেবে ২০১৮ সালে কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিস সনদকে স্নাতকোত্তর সনদের সমমান ঘোষণা করা হয় (প্রথম আলো, ২০১৮)। সাম্প্রতিক সময়ে অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের সময়েও রক্ষণশীল ধারার প্রাধান্য দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এই সময়কালে বিভিন্ন মাজার ও দরগায় হামলা ও ভাঙচুর, ধর্ম অবমাননার অভিযোগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সহিংসতা, নারীদের পোশাক ও চলাচল ঘিরে হয়রানি, এসব ঘটনা রক্ষণশীল ইসলামের সামাজিক কর্তৃত্ব ও অসহিষ্ণু প্রবণতার বাস্তব প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হয় (বুবুন, ২০২৫)।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে মুসলিম পরিচয় ও ইসলাম ধর্মের উপস্থাপন

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে মুসলিম পরিচয়, ধর্মীয় ভাবধারা ও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হলেও, ইসলামের আভ্যন্তরীণ মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব, বিশেষত সহজিয়া ও রক্ষণশীল ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্ক এখনও পর্যাপ্তভাবে বিশ্লেষিত হয়নি। বিদ্যমান সাহিত্য মূলত পরিচয় নির্মাণ, আধুনিকতা বনাম ধর্ম, এবং সুফিবাদ ও জঙ্গিবাদের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

রাজু (২০০৮) সমসাময়িক বাংলাদেশি চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখান যে, আর্ট সিনেমাগুলোতে 'বাঙালি' পরিচয়কে আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে স্বাভাবিকীকরণ করা হয়, বিপরীতে 'মুসলিম' পরিচয়কে সংকীর্ণ ধর্মীয় অনুশীলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে উপস্থাপন করা হয়। এই নির্মাণে মুসলিম চরিত্র প্রায়শই আধুনিকতার প্রতিবন্ধক, পশ্চাদপদ ও অনমনীয় হিসেবে চিহ্নিত হয়, যা চলচ্চিত্রিক বয়ানে একটি নেতিবাচক ইমেজ উৎপাদন করে (Raju, 2008)। তবে এই বিশ্লেষণ ইসলামের আভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্যকে পৃথকভাবে অনুধাবন করে না। অন্যদিকে, হক ও বালরাজ (২০১০) *মাটির ময়না* (২০০২) চলচ্চিত্র বিশ্লেষণে বাঙালিত্ব ও মুসলিমত্বের দ্বন্দ্বের পাশাপাশি একটি তৃতীয় পরিচয় কাঠামোর উপস্থিতি চিহ্নিত করেন, যা জনপ্রিয় বা লোকজ ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁদের মতে, নির্মাতা সহজিয়া বা লোকায়ত ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল অবস্থান গ্রহণ করে পরিচয় নির্মাণে বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন (Haq & Balraj, 2010)। এই গবেষণা ইসলামের ভিন্ন রূপের স্বীকৃতি দিলেও সহজিয়া ও রক্ষণশীল ধারার ক্ষমতাগত দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণে প্রবেশ করে না।

মামুন (২০১৩) বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে ইসলামি জঙ্গিবাদ উপস্থাপনকে রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে, আবু সাইয়ীদের *অপেক্ষা* (২০১০) ও তারেক মাসুদের *রানওয়ে* (২০১০) চলচ্চিত্রে জঙ্গিবাদকে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যার ফল হিসেবে ফ্রেমিং করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় আইন ও আধুনিক শাসনব্যবস্থাকে নৈতিক কর্তৃত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে (মামুন, ২০১৩)। এই বিশ্লেষণে ধর্মীয় সহিংসতা বনাম রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হলেও ইসলামের আধ্যাত্মিক বা লোকজ ধারার অবস্থান অনালোচিত থেকে যায়। একইভাবে, হোসেন (২০২১) *জান্নাত* (২০১৮) চলচ্চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সুফিবাদ ও জঙ্গিবাদের দ্বন্দ্ব কীভাবে নির্মিত হয় তা দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, চলচ্চিত্রটি জঙ্গিবাদকে ইসলামের 'ভ্রান্ত পথ' হিসেবে ফ্রেমিং করে এবং সুফিবাদকে প্রেম, মানবতা ও আধ্যাত্মিক মুক্তির 'সঠিক পথ' হিসেবে উপস্থাপন করে। এখানে সুফিবাদ মানবিকতা, প্রেম ও আধ্যাত্মিক মুক্তির প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়। তবে এই পাঠেও ইসলামের সাংস্কৃতিক ও ক্ষমতাগত সংঘাত পৃথকভাবে আলোচিত হয়নি।

হক (২০১৭) বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে ইসলামের উপস্থাপনার একটি মৌলিক সীমাবদ্ধতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর মতে, অধিকাংশ চলচ্চিত্রনির্মাতা ইসলামকে একটি একক ও সমজাতীয় ধর্মীয় সত্তা হিসেবে কল্পনা করেন, যার ফলে সুফি, শাস্ত্রীয় ও রাজনৈতিক ইসলামের মধ্যকার পার্থক্য চলচ্চিত্রে অনুপস্থিত থাকে। এই একরৈখিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ইসলামের আভ্যন্তরীণ বহুত্ব ও মতাদর্শিক জটিলতা পর্দায় প্রতিফলিত হয় না (হক, ২০১৭)। এই পর্যবেক্ষণ ইসলামের আভ্যন্তরীণ বহুত্ব বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

উপর্যুক্ত সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে মুসলিম পরিচয় ও ইসলামের বিভিন্ন রূপ নিয়ে আলোচনা থাকলেও সহজিয়া ইসলাম ও রক্ষণশীল ইসলামের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক এখনও পদ্ধতিগতভাবে অনালোচিত। তানভীর মোকাম্মেলের *লালসালু* (২০০১) চলচ্চিত্র এই শূন্যস্থান পূরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, যেখানে লোকজ-সহজিয়া বিশ্বাস ও কর্তৃত্ববাদী রক্ষণশীল ইসলামের সংঘাত চলচ্চিত্রিক বয়ানের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে। আলোচ্য প্রবন্ধ এই প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান সাহিত্যকে সম্প্রসারিত করে ইসলামের আভ্যন্তরীণ বহুত্ব ও আধিপত্যমূলক ধর্মীয় ভাষ্যকে নতুনভাবে পাঠ করার প্রয়াস গ্রহণ করেছে।

তাত্ত্বিক কাঠামো

লালসালু (২০০১) চলচ্চিত্রে সহজিয়া ও রক্ষণশীল ইসলামের দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণের জন্য দুটি তাত্ত্বিক কাঠামোর প্রয়োগ করা হয়েছে: (১) আন্তোনিও গ্রামসির 'সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ (Cultural Hegemony) তত্ত্ব' ও (২) স্টুয়ার্ট হলের 'রিপ্রেজেন্টেশন (Representation) তত্ত্ব'। এই দুটি তত্ত্বের মাধ্যমে *লালসালু* চলচ্চিত্রে ইসলাম ধর্মের ভাবধারা, ক্ষমতা, আদর্শ, সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনির্মাণের জটিল গতিশীলতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ তত্ত্ব (Cultural Hegemony Theory)

ইতালীয় মার্কসবাদী চিন্তাবিদ আন্তোনিও গ্রামসি (১৯৭১) তাঁর 'Prison Notebooks'-এ 'সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ' ধারণা উপস্থাপন করেন। গ্রামসির মতে, শাসক বা প্রভাবশালী শ্রেণি সমাজে আধিপত্য কায়েম করে শুধু বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরং ধর্ম, শিক্ষা, গণমাধ্যম ও সংস্কৃতির মাধ্যমে সম্মতিপূর্ণ আনুগত্য অর্জনের দ্বারা। এই প্রক্রিয়ায় তাদের বিশ্বদৃষ্টি সমাজের সর্বস্তরে এমনভাবে গৃহীত হয় যে তা 'সাধারণ জ্ঞান' হিসেবে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়া হয় (Lears, 1985; Gramsci, 1971)। এর ফলে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষও অবচেতনভাবে এই আধিপত্যকে ন্যায্য ও অবধারিত বলে স্বীকার করে নেয়।

গ্রামসির ধারণা অনুযায়ী, আধুনিক সমাজে ধর্ম, শিক্ষা ও জনপ্রিয় সংস্কৃতি শাসক শ্রেণির মতাদর্শকে বৈধতা দেয় এবং বিকল্প মতকে বিপজ্জনক বা অবাস্তব হিসেবে চিহ্নিত করে (Zavala, 2022)। ফলে একটি সমাজে সংস্কৃতি, ধর্ম, ও নৈতিকতার ধারণা কেবল নৈতিক বা আধ্যাত্মিক নয়, বরং ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের উপকরণে পরিণত হয় (Gramsci, 1971)। এই দৃষ্টিভঙ্গি গণমাধ্যম ও চলচ্চিত্র বিশ্লেষণে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কারণ মিডিয়া হেজেমনি তত্ত্ব অনুসারে, গণমাধ্যম বিদ্যমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সহায়তায় সমাজে প্রভাবশালী মূল্যবোধ ও চিন্তাধারা প্রচার করে (Arty, 2013)।

এই প্রেক্ষাপটে তানভীর মোকাম্মেল পরিচালিত *লালসালু* (২০০১)-তে মজিদ চরিত্রটি গ্রামীণ সাংস্কৃতিক আধিপত্যের প্রতীক হিসেবে বিশ্লেষণযোগ্য। মজিদ ধর্মকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও ভয় সৃষ্টি, পাপবোধ ও অন্ধ আনুগত্য তৈরির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, যার মাধ্যমে একটি সাংস্কৃতিক শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ফলে গ্রামসির সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ তত্ত্ব চলচ্চিত্রে ধর্মীয় আধিপত্য, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে কার্যকর কাঠামো প্রদান করে (Zavala, 2022; Arty, 2013; Lears, 1985)।

রিপ্রেজেন্টেশন তত্ত্ব (Representation Theory)

সাধারণভাবে রিপ্রেজেন্টেশন হলো এমন একটি প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অংশ যার মাধ্যমে একটি সংস্কৃতির সদস্যদের মধ্যে অর্থ উৎপন্ন ও বিনিময় হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে ভাষা, চিহ্ন ও ইমেজের ব্যবহার সূত্রে বিভিন্ন বিষয়ের অর্থ নির্দেশ ও উপস্থাপন করা হয় (ওহীদ, ২০১০)। 'রিপ্রেজেন্টেশন' শব্দটি মূলত নির্দেশ করে কীভাবে বাস্তবতা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ভাষা, প্রতীক, চিত্র ও বয়ানের মাধ্যমে নির্মিত ও উপস্থাপিত হয়। এই ধারণাটি বিশ্লেষণ করেছেন স্টুয়ার্ট হল তাঁর "Representation: Cultural Representations and Signifying Practices" (1997) গ্রন্থে। তিনি বলেন, রিপ্রেজেন্টেশন হলো অর্থ উৎপাদনের প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো বস্তু, ধারণা বা সামাজিক বাস্তবতা ভাষা ও চিত্রের মাধ্যমে সাংকেতিক রূপে সমাজে প্রচারিত হয় (Hall, 1997)। তাঁর মতে, রিপ্রেজেন্টেশন শুধুমাত্র বাস্তবতার প্রতিফলন নয়; বরং এটি বাস্তবতাকে নির্মাণ করে। গণমাধ্যম, সাহিত্য বা চলচ্চিত্রে কোনো গোষ্ঠী, ধর্ম বা মতাদর্শ যেভাবে উপস্থাপিত হয়, তা দর্শকের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনায় গভীর প্রভাব ফেলে (Hall, 1997)। তাই কোন অর্থগুলো জোরদার করা হচ্ছে, কোনগুলো আড়াল করা হচ্ছে, এবং এই উপস্থাপনাগুলো কীভাবে ক্ষমতার সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত, তা বিশ্লেষণ করাই রিপ্রেজেন্টেশন সম্পর্কিত ধারণার লক্ষ্য (Kellner, 2011)।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী, চলচ্চিত্র শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি সমাজের 'অর্থ-নির্মাণকারী যন্ত্র' হিসেবে কাজ করে। চলচ্চিত্রের চরিত্র, দৃশ্য, পোশাক, ভাষা ও চিত্ররূপ সমাজে প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসকে পুনরুৎপাদন বা চ্যালেঞ্জ করতে পারে (Hall, 1997; Dyer, 1993)। এই প্রেক্ষাপটে *লালসালু* (২০০১) চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে ইসলামের বিভিন্ন রূপ - বিশেষত সহজিয়া ধারার মানবিক ইসলাম ও রক্ষণশীল ইসলামের কর্তৃত্ববাদী সংস্করণ - কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তা এই তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রিপ্রেজেন্টেশন তত্ত্বের তিনটি অ্যাপ্রোচের (প্রতিফলনকারী, স্বেচ্ছাকৃত ও নির্মাণমূলক) মধ্যে এই প্রবন্ধে 'প্রতিফলনকারী' ও 'নির্মাণমূলক' রিপ্রেজেন্টেশন প্রাধান্য পেয়েছে।

সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ তত্ত্ব চলচ্চিত্রে ধর্মীয় ক্ষমতার উৎপাদন ও সমাজে তার স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে, আর রিপ্রেজেন্টেশন তত্ত্ব সেই ক্ষমতার সাংস্কৃতিক উপস্থাপন কেমনভাবে চলচ্চিত্রিক ভাষায় গঠিত হয় তা বিশ্লেষণ করে। দুটি তত্ত্ব একত্রে ব্যবহারের ফলে চলচ্চিত্রের ভেতরকার ধর্মীয় দ্বন্দ্ব তথা রক্ষণশীল ইসলাম বনাম সহজিয়া মানবতাবাদ-এর অর্থ-উৎপাদন ও সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে বোঝা সম্ভব হয়।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি গুণগত পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছে, যেখানে চলচ্চিত্রকে একটি সাংস্কৃতিক পাঠ হিসেবে বিবেচনা করে তার আখ্যান, ভিজ্যুয়াল নির্মাণ ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার প্রেক্ষাপট সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার প্রধান পদ্ধতি হিসেবে আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে *লালসালু* (২০০১) চলচ্চিত্রের কাহিনী, চরিত্র নির্মাণ, সংলাপ, দৃশ্যবিন্যাস, ভিজ্যুয়াল প্রতীক, রঙের ব্যবহার ও সাংস্কৃতিক ইঙ্গিতসমূহ পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি সাংস্কৃতিক টেক্সটে নিহিত মতাদর্শ, ক্ষমতা কাঠামো ও অর্থ উৎপাদনের প্রক্রিয়া উন্মোচনে একটি কার্যকর গবেষণা কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয় (Krippendorff, 2019)।

অন্যদিকে, তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রটিকেই মূল টেক্সট হিসেবে ধরে টেক্সচুয়াল বিশ্লেষণ সম্পাদন করা হয়েছে। টেক্সচুয়াল বিশ্লেষণের প্রয়োগে চলচ্চিত্রের বয়ান ও ভিজ্যুয়াল উপাদানকে দুটি পরিপূরক বিশ্লেষণ কাঠামোর আলোকে পাঠ করা হয়েছে, যা হলো 'থিমেটিক' ও 'সেমিওটিক' বিশ্লেষণে। থিমেটিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে চলচ্চিত্রে পুনরাবৃত্ত বিষয়বস্তু, আখ্যান কাঠামো ও ভাবগত দ্বন্দ্ব চিহ্নিত করা হয়েছে, যা সহজিয়া মানবতাবাদী ইসলাম ও রক্ষণশীল শরিয়তকেন্দ্রিক ইসলামের পারস্পরিক

বিরোধকে স্পষ্ট করে তোলে (Braun & Clarke, 2006)। অন্যদিকে, সেমিওটিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দৃশ্য, প্রতীক, পোশাক, দেহভঙ্গি, স্থান ও ভিজ্যুয়াল মোটিফগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ ও মতাদর্শিক সংকেত পাঠ করা হয়েছে (Barthes, 1977)।

চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ ও আলোচনা

সহজিয়া ইসলাম: লোকসংস্কৃতি ও মানবিক ধর্মচেতনার প্রতিরূপ

লালসালু চলচ্চিত্রের প্রারম্ভিক অংশে মহব্বতপুর গ্রামের ধর্মীয় জীবন মূলত লোকাচার, সংগীত ও সমবায়ী সাংস্কৃতিক অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। শিলারী নৃত্য, বাউল গান ও ধান কাটার সময় কৃষকদের সম্মিলিত গান সহজিয়া ইসলামের মানবিক ও সহনশীল রূপকে নির্দেশ করে। এসব অনুশীলনে শরিয়তভিত্তিক বিধিনিষেধ অনুপস্থিত; বরং জীবন, প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে এক ধরনের সুষম সম্পর্ক লক্ষ করা যায় (ভট্টাচার্য, ১৯৫৭)।

চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত 'শিলারী আচার' সহজিয়া সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা ঝড় ও শিলাবৃষ্টি থেকে ফসল রক্ষার এক লোকাচার। শিলারীর লাল পোশাক, গলায় মালা, হাতে ছাই ও শিঙ্গা বাজানোর দৃশ্য ধর্মীয় আচারের চেয়ে লোকজ আধ্যাত্মিকতার প্রতীক হিসেবেই বেশি কাজ করে। আহমদ (১৯৬৫) উল্লেখ করেছেন যে, শিলারী বা হিরালী আচার পূর্ববঙ্গের কৃষিভিত্তিক সমাজে ফসল রক্ষার জন্য প্রচলিত একটি লোকবিশ্বাসনির্ভর প্রথা। বাংলার মানুষের বিশ্বাস এরূপ আচারের দ্বারা (মন্ত্র পাঠ ও শিঙ্গা বাজিয়ে মেঘ তাড়ানো) শিলারী আসন্ন শিলাবৃষ্টি বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে ফসল রক্ষা করতে পারে। চলচ্চিত্রে এই আচারের উপস্থিতি দেখায় যে, মহব্বতপুরের ধর্মীয় চর্চা শরিয়তভিত্তিক নয়; বরং এটি লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত একটি কার্যকর বিশ্বাসব্যবস্থা।

চিত্র ১ ও ২: শিলাবৃষ্টি থেকে ফসলের ক্ষেতকে রক্ষা করতে শিলারী মন্ত্র পাঠ করে এবং শিঙ্গা বাজিয়ে মেঘ তাড়ায়। পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের বিশ্বাস মতে, শিলারীর এরূপ আচার শিলাবৃষ্টি থেকে ফসল রক্ষা করে।

চলচ্চিত্রে বাউলগানের ব্যবহার সহজিয়া ইসলামের মানবিক দর্শনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপস্থাপন। *"এমন মানব জনম আর কি হবে, মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে"* গানটি প্রেম, আত্মসাধনা ও মানবকেন্দ্রিক ধর্মচেতনার প্রতীক। ভট্টাচার্য (১৯৫৭) দেখিয়েছেন, বাউলধর্ম মুসলমান ফকির ও সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার সম্মিলিত ফল, যেখানে দেহতত্ত্ব ও 'মনের মানুষ' ধারণা মুখ্য। চলচ্চিত্রটিতে বাউলগান শুধু সংগীত নয়; বরং এটি সহজিয়া ইসলামের এক ধর্মীয় রিপ্রেজেন্টেশন। রিপ্রেজেন্টেশন তত্ত্বের 'নির্মাণমূলক' ধারণার আলোকে এই সংগীত বাস্তবতার প্রতিফলন নয়; বরং অর্থ নির্মাণের একটি সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া। তানভীর মোকাম্মেল বাউলগানকে ব্যবহার করে ইসলামের একটি বিকল্প, মানবিক পাঠ নির্মাণ করেছেন, যা রক্ষণশীল ধর্মীয় কাঠামোর বিপরীতে অবস্থান করে। এছাড়া চলচ্চিত্রে ধান কাটার সময় কৃষকদের সমবায়ী গান *"প্রাণ সখিরে... ঐ শোন কদম্বতলে বংশী বাজায় কে"* ও আনন্দমুখর দৃশ্য বাংলার কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে ধর্ম, শ্রম ও আনন্দের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়। এখানে আধ্যাত্মিকতা কোনো আনুষ্ঠানিক অনুশাসনে আবদ্ধ নয়; বরং প্রকৃতিনির্ভর জীবনযাপনের মধ্যেই তার প্রকাশ ঘটে। এই উপস্থাপন সহজিয়া ধারার মূল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চিত্র ৩ ও ৪: পূর্ববাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজে কৃষক মনের আনন্দে গান গায় ও সন্ধ্যার অবসরে বাউল গান শুনে। এগুলো সহজিয়া ধারার বাস্তব উদাহরণ।

চলচ্চিত্রে গ্রামবাসীদের ধর্মীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাও তাৎপর্যপূর্ণ। কালেমা বা শরিয়তের মৌলিক বিধান সম্পর্কে অনাগ্রহ ধর্মীয় উদাসীনতা নয়; বরং জীবনঘনিষ্ঠ বিশ্বাসব্যবস্থার প্রতিফলন। কালেমা না জানা এক গ্রামবাসী যখন বলে, "গরীব মানুষ, খাইবার পাই না" - এই সংলাপ ধর্মচর্চার সঙ্গে অর্থনৈতিক বাস্তবতার সংযোগকে নির্দেশ করে, যা সহজিয়া ইসলামের কঠোর বিধিনিষেধের পরিবর্তে লোকাচার ও মানবিক জীবনের সঙ্গে ধর্মের সমন্বয়কে গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টিকে প্রতিফলিত করে (নোমান, ২০২৪)।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, *লালসালু*-এর মহব্বতপুর গ্রাম একটি সহজিয়া সাংস্কৃতিক পরিসর, যেখানে ধর্ম ও লোকসংস্কৃতি পরস্পরবিরোধী নয়; বরং গান, আচার ও দৈনন্দিন জীবনের মধ্য দিয়ে এখানে আধ্যাত্মিকতা স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়েছে। এই মানবিক ধর্মচেতনার বিপরীতে পরবর্তীকালে রক্ষণশীল ইসলামের কর্তৃত্ববাদী কাঠামো স্পষ্টভাবে এক দ্বন্দ্বমূলক অবস্থান তৈরি করে।

সহজিয়া বনাম রক্ষণশীল ইসলামের দ্বন্দ্ব: শরিয়ত, ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের রাজনীতি

লালসালু চলচ্চিত্রে মহব্বতপুর গ্রামের ধর্মীয় জীবন প্রাথমিকভাবে সহজিয়া ইসলামের মানবিক ও লোকজ বৈশিষ্ট্যে গঠিত। শিলারী আচার, ধান কাটার সময় সম্মিলিত গান ও বাউল সঙ্গীত গ্রামীণ সমাজে ধর্মকে আনন্দ, প্রকৃতি ও সমবায়ী জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে। এসব অনুশীলনে শরিয়তভিত্তিক কঠোরতা অনুপস্থিত; বরং ধর্ম এখানে একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা, যা সহনশীলতা ও মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সহজিয়া ধর্মচর্চার বিপরীতে মজিদ চরিত্রের আবির্ভাব গ্রামে একটি ভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শের অনুপ্রবেশ নির্দেশ করে। গ্রামীণ জনতার লোকাচার, গান, ও বাউলসাধনা মজিদের চোখে 'অধার্মিক', 'বেদাতি' ও 'অবৈধ' হিসেবে প্রতীয়মান হয়। এই নিষেধাজ্ঞামূলক ভাষা ধর্মীয় শুদ্ধতার দাবি নয়, বরং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার একটি কৌশল। গ্রামসির সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ তত্ত্বের 'সম্মতি' (Consent) ধারণা অনুযায়ী, আধিপত্য কেবল বলপ্রয়োগে নয়, বরং সম্মতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে এক সামাজিক গোষ্ঠী (ধর্মীয় নেতা) সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজে সম্মতিপূর্ণ আধিপত্য গড়ে তোলে (Lears, 1985)। মজিদ সেই সম্মতি উৎপাদনের চেষ্টা করেন ধর্মীয় ভাষা ও নৈতিক কর্তৃত্বের মাধ্যমে।

চলচ্চিত্রে মজিদ চরিত্রটি রক্ষণশীল ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে, যিনি ধর্মকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। তিনি শিলারী নৃত্য, বাউল গান ও ধান কাটার সময়ের গানকে 'বে-শরিয়তি' ও 'হারাম' আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। চলচ্চিত্রে শিলারী আচার নিয়ে মজিদের বক্তব্য, "*আপনাদের দেশটা বড় জাহেলীয় দেশ। তাও আমি থাকাতে 'শিলারী তন্ত্রমন্ত্র' এসব বে-শরিয়াতি কাজ কারবার কিছুটা বন্ধ হয়েছে।*" বাউল গানের অনুষ্ঠানে মজিদ গ্রামবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, "*আপনারা এখনও বেদাতি নিয়ে মাতিয়াছেন। ইসলামে গানবাজনা হারাম, তা জানেন না।*" গ্রামের কৃষকদের ধান কাটার সময় গান গাওয়া দেখার পর মজিদ এক কৃষক বলেন, "*খোদাই রিযিক দেনেওয়ালা। মাঠ ভরা ধান দেইখ্যা যাদের মনে মাটির জন্য পূজার ভাব জমে তারা ভূত পুজারী, গুনাহগার।*" চলচ্চিত্রে তার এসব বক্তব্য ধর্মীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কৌশলকে প্রকাশ করে। চলচ্চিত্রে মজিদের বক্তব্য ও আচরণ একটি প্রতীকী স্তরে কাজ করে। তিনি কেবল ব্যক্তিমানুষ নন; বরং রক্ষণশীল

ইসলামের একটি প্রতিনিধিত্বশীল চিহ্ন। হলের রিপ্রেজেন্টেশন তত্ত্বের 'নির্মাণমূলক' ধারণার আলোকে বলা যায়, মজিদ চরিত্রটি বাস্তবের প্রতিফলনমাত্র নয়, বরং অর্থ-নির্মাণের একটি প্রক্রিয়ার অংশ, যার মাধ্যমে রক্ষণশীল ধর্মীয় মতাদর্শকে 'সত্য ইসলাম' হিসেবে স্বাভাবিকীকরণ করা হয় (হল, ১৯৯৭)। সহজিয়া লোকাচারকে 'অজ্ঞতা' ও 'জাহেলিয়াত' হিসেবে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে তিনি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিভাজন তৈরি করেন।

এই দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক ভিত্তি চলচ্চিত্রটির পাঠে প্রতিধ্বনিত হয়। মধ্যযুগীয় বাংলায় সহজিয়া ইসলাম ছিল প্রভাবশালী লোকধর্মীয় ধারা, যা উনবিংশ শতকে ফরায়েজি আন্দোলনসহ সংস্কারবাদী ইসলামের উত্থানে প্রান্তিক হয়ে পড়ে (Haq, 2020)। হাজী শরীয়তউল্লাহর নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন নাচ-গান ও লোকাচার বর্জনের আহ্বান সহজিয়া ধারার সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে, যা সামাজিক উত্তেজনা ও সহিংসতার রূপ নেয় (খান, ২০০৭)। *লালসালু* চলচ্চিত্র সেই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বকেই গ্রামীণ পরিসরে পুনর্নির্মাণ করে।

চিত্র ৫ ও ৬: মজিদ বাউল গান এবং ধান কাটার গানকে 'বেশরিয়াতি' ও 'হারাম' আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই প্রক্রিয়ায় লোকসংস্কৃতি ও ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে।

সার্বিকভাবে, চলচ্চিত্রটি সহজিয়া ইসলামের মানবিক, সহিষ্ণু ও লোকজ চর্চার বিপরীতে রক্ষণশীল ইসলামের কর্তৃত্ববাদী ও শাসনমূলক রূপকে মুখোমুখি দাঁড় করায়। এই দ্বন্দ্ব ধর্মীয় মতভেদের বাইরে গিয়ে সংস্কৃতি, ক্ষমতা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের রাজনীতিকে উন্মোচিত করে। ফলে *লালসালু* কেবল ধর্মীয় সংঘাতের কাহিনী নয়; এটি গ্রামীণ সমাজে সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও পুনরুৎপাদনের এক সমালোচনামূলক চলচ্চিত্রিক পাঠ, যা গ্রামসির 'সম্মতি' (Lears, 1985) ও হলের 'রিপ্রেজেন্টেশন' তত্ত্বের 'নির্মাণমূলক' ধারণার আলোকে (Hall, 1997) অর্থবহ হয়ে ওঠে।

ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ: ধর্ম, ভয় ও সম্মতির রাজনীতি

লালসালু চলচ্চিত্রে ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা আধ্যাত্মিক চর্চা হিসেবে উপস্থিত নয়; বরং এটি সামাজিক শাসন, সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা উৎপাদনের একটি কার্যকর যন্ত্রে রূপ নেয়। মজিদ চরিত্রটি এই ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের কেন্দ্রীয় প্রতীক, যার মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজে একটি নতুন মতাদর্শিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দৃশ্যমান হয়। গ্রামসির সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ তত্ত্ব অনুযায়ী, আধিপত্য রাজনৈতিক বলপ্রয়োগের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও নৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমেও কার্যকর হয় (Gramsci, 1971)। মজিদের ধর্মীয় কর্তৃত্ব এই তাত্ত্বিক কাঠামোর একটি চলচ্চিত্রিক বাস্তবায়ন।

চলচ্চিত্রে মজিদের ক্ষমতার ভিত্তি গড়ে ওঠে একটি কৃত্রিম পবিত্রতা নির্মাণের মাধ্যমে। সে কাল্পনিক 'মোদাচ্ছের পীর'-এর নামে একটি কবরকে 'লালসালু' বা লাল কাপড়ে মোড়ানো 'মাজার' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে, যা গ্রামীণ মানুষের ভয়, বিশ্বাস ও ধর্মীয় আবেগকে কেন্দ্র করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এক প্রতীকী স্থান হয়ে ওঠে। এই 'লালসালু' পবিত্রতার চিহ্ন হলেও বাস্তবে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই নির্মিত পবিত্রতা ধর্মকে একটি নৈতিক সত্যের বদলে শাসনব্যবস্থায় রূপান্তরিত করে। মজিদের নির্দেশে ভিক্ষুকদের মাজার এলাকা থেকে সরিয়ে দেয়া বা গ্রামের দান-খয়রাতকে মাজারকেন্দ্রিক করা ধর্মীয় আধিপত্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক উন্মোচন করে। ধর্মীয় কর্তৃত্বের আরেকটি দিক প্রকাশ পায় শিক্ষার বিরোধিতায়। আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে মজিদ ধর্মীয় ভাষায় প্রশ্নবিদ্ধ করেন, "তুমি না মুসলমানের পোলা, *তোমার মুখে রসুলে সুন্নত কই?*" - যার মাধ্যমে যুক্তিবোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের বিকাশকে 'অধর্মীয়' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এটি দেখায়, কীভাবে ধর্মীয় ভাষ্য আধুনিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার বিরুদ্ধে একটি রক্ষণশীল অবস্থান নেয় এবং সামাজিক পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।

আবার, আওয়ালপুরের পীরের আগমনে মজিদের কর্তৃত্ব যখন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে, তখন সে 'অপর'-এর বিরুদ্ধে ভীতি ও বিভাজনের রাজনীতিকে সক্রিয় করে। প্রতিদ্বন্দ্বী পীরকে 'ভণ্ড' ও 'বে-ইসলামি শক্তি' হিসেবে চিহ্নিত করে গ্রামবাসীদের উসকানি দিয়ে বলেন, "*মানুষকে বিপথে নেবার জন্য শয়তান নানা ধরনের ভেক ধরে। কিন্তু যারা খোদার বান্দা, যাদের দিলে ইসলাম জিন্দা আছে তারা সে মুখোশ চিনে ফেলতে দেরি হয় না। ঐ পীরের লক্ষ্য হচ্ছে এদেশে বে-ইসলামি কাজ-কারবার করা। মানুষকে দ্বীন-ইসলাম থেকে সরায়ে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাওয়া।*" এই উসকানি সাংস্কৃতিক আধিপত্যের একটি পরিচিত কৌশল, যেখানে নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে বিকল্প ধর্মীয় ভাষ্যকে শত্রুতে পরিণত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ধর্ম সামাজিক সহিংসতা ও নৈতিক সন্ত্রাসের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

চিত্র ৭ ও ৮: মজিদের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী 'আওয়ালপুরের পীর'-এর সাথে দ্বন্দ্ব। নিজের কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য মজিদ সেই পীরকে 'ভণ্ড' আখ্যা দিয়ে গ্রামবাসীদের উসকে দেয়।

চলচ্চিত্রে ধর্মীয় আধিপত্যের সবচেয়ে সূক্ষ্ম কিন্তু কার্যকর রূপটি প্রকাশ পায় নারীর শরীর ও আচরণের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রশ্নে। রহিমা ও জমিলার হাঁটা, হাসি, পোশাক ও চলাচল নিয়ে মজিদের নির্দেশাবলি নারীর দেহকে ধর্মীয় শুদ্ধতার বাহক হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করার মানসিকতাকে প্রতিফলিত করে। মজিদ রহিমাকে বলে, "*অমন করে হাঁটতে নাই বিবি, মাটি গোস্বা করে...অমন দপদপিয়ে হাঁটিও না।*" অন্যদিকে, জমিলার হাসির শব্দ শুনে সে রুষ্ট হয়ে বলে, "*মুসলমানের মাইয়ার হাসি কেউ শুনে না।*" এছাড়া রহিমা গোসল করার পর কাপড় শুকাতে গেলে মজিদ বলে, "*খোলা জায়গায় অমন বেশরমের মতো দাঁড়িয়ো না গো বিবি।*" এই সংলাপগুলো নারী-অবদমনমূলক রক্ষণশীল ধর্মীয় মানসিকতার প্রতিফলন, যেখানে নারীর স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বকে দমন করা হয়। এখানে ধর্মীয় কর্তৃত্ব পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নারীর নীরবতা ও আত্মসংযমকে 'ইসলামি আদর্শ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এটি ধর্মীয় কর্তৃত্বের আরেকটি মনস্তাত্ত্বিক কৌশল, যা সমাজে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের সাথে ধর্মীয় আধিপত্যের সংমিশ্রণ ঘটায়।

সেমিওটিক স্তরে পরিচালক এই ক্ষমতার অসমতা চিত্রভাষার (visual language) মাধ্যমে দৃশ্যমান করেন। মজিদকে প্রায়শই লো-অ্যাঙ্গেল বা স্ট্যাটিক ফ্রেমে ধারণ করা হয়, যা তাকে প্রতীকীভাবে উচ্চতর ও কর্তৃত্বশীল করে তোলে। বিপরীতে, নারী ও সাধারণ গ্রামবাসীদের হাই-অ্যাঙ্গেল বা অবনত ফ্রেমে দেখানো হয়, যা তাদের ভয়, আনুগত্য ও অধীনতার ইঙ্গিত বহন করে। এই ভিজ্যুয়াল বৈপরীত্য ধর্মীয় ক্ষমতার অসাম্যকে দৃশ্যমান করে তোলে, যেখানে মজিদের দৃষ্টি, ভঙ্গি ও অবস্থান ঐশ্বরিক, আর জনগণ অবনত ও বাধ্য। এই ভিজ্যুয়াল বিন্যাস ধর্মীয় ক্ষমতার প্রতিফলনকারী রিপ্রেজেন্টেশন হিসেবে কাজ করে (হল, ১৯৯৭)।

চিত্র ৯ ও ১০: চলচ্চিত্রে মজিদকে ক্ষমতাবান দেখাতে লো-অ্যাঙ্গেল শটে ধারণ করা হয়েছে, বিপরীতে, অধীনতা বুঝাতে সাধারণ গ্রামবাসীদের হাই-অ্যাঙ্গেল শটে দেখানো হয়েছে।

সার্বিকভাবে, *লালসালু* চলচ্চিত্রটি ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের এক জটিল কাঠামো উন্মোচন করে, যেখানে রক্ষণশীল ইসলাম মানবিক আধ্যাত্মিকতার বদলে নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের প্রতীকে রূপান্তরিত হয়। সহজিয়া ইসলামের সহিষ্ণু ও লোকজ বিশ্বাসের বিপরীতে মজিদের কর্তৃত্ববাদী ইসলাম ধর্মকে 'শক্তি' ও 'নিয়ন্ত্রণ'-এর প্রতীকে রূপান্তরিত করে। ফলে চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের ধর্মীয় সংস্কৃতির ভেতর নিহিত ক্ষমতা, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব উপস্থাপনের একটি প্রতীকী দলিল হয়ে ওঠে।

আধুনিকতা ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব: শিক্ষা, ক্ষমতা ও প্রতিরোধের রাজনীতি

লালসালু চলচ্চিত্রে পরিচালক গ্রামীণ বাংলার সমাজে আধুনিকতা ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতার মধ্যকার দ্বন্দ্বকে অন্যতম থিম হিসেবে নির্মাণ করেছেন। এখানে আক্কাস চরিত্রটি আধুনিক শিক্ষা, যুক্তিবাদ ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে, বিপরীতে মজিদ ধর্মীয় কর্তৃত্বনির্ভর রক্ষণশীল ইসলামের প্রতীক। এই দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত বিরোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে একটি বৃহত্তর আদর্শিক সংঘাতে রূপ নেয়।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বাংলায় শিক্ষাবিস্তারে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা ও কৃষিপ্রধান গ্রামীণ সমাজে শিক্ষার প্রসারে বেসরকারি উদ্যোগ (আহমদ, ২০০৭) চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই বাস্তবতায় আক্কাসের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আধুনিক চেতনার বিকাশের প্রতীক, যেখানে তার বক্তব্য, "*আজকাল ইংরেজি না পড়লে চলবে কীভাবে?*" - উপনিবেশোত্তর সমাজে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু মজিদ এই উদ্যোগকে ইসলামবিরোধী ও সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেন। তার দৃষ্টিতে মক্তবই একমাত্র বৈধ জ্ঞানব্যবস্থা; ফলে আধুনিক শিক্ষার বিকল্প হিসেবে তিনি ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। মজিদ

বলেন, *"গ্রামে মক্তব আছে, নদীর ওপারে এবতেদায়ি মাদ্রাসা আছে। স্কুলের দরকার কি?"* গ্রামবাসী তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বলে, *"ঠিক আছে। স্কুলের কামটা কি?"* এভাবে আক্কাসের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে গ্রামবাসীদের উসকে দেয় মজিদ।

মজিদের এই অবস্থান গ্রামসির সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ তত্ত্বের 'সম্মতি উৎপাদন' ধারণার (Lears, 1985) মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। ধর্মীয় ভাষা ও সাংস্কৃতিক প্রতীক ব্যবহার করে তিনি গ্রামবাসীকে এমনভাবে প্রভাবিত করেন যে তারা নিজেরাই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে। অন্যদিকে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি কৌশলে পাকা মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাবে পরিবর্তিত হওয়ার মাধ্যমে কীভাবে আধুনিকতার সম্ভাবনাকে ধর্মীয় আবেগ ও সম্মতির রাজনীতির মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করা হয়, তা দেখা যায়।

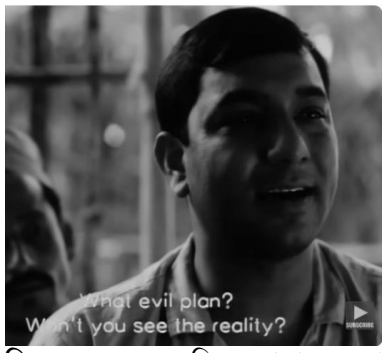

চিত্র ১১ ও ১২: চলচ্চিত্রে আক্কাসের দৃশ্যগুলো উজ্জ্বল আলোয়, মুক্ত প্রান্তরে ধারণ করা হয়েছে, যা উন্মুক্ত চিন্তার প্রতীক। অন্যদিকে, মজিদের দৃশ্যগুলো অন্ধকার, সংকীর্ণ ও গম্ভীর পরিবেশে নির্মিত, যা ধর্মীয় ভীতি ও নিয়ন্ত্রণের প্রতীক।

পরিচালক ক্যামেরার ভাষার মাধ্যমে সেমিওটিকভাবে এই দ্বন্দ্বকে আরো দৃশ্যমান করেছেন। আক্কাসকে উন্মুক্ত ও আলোকিত ফ্রেমে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা মুক্তচিন্তা ও অগ্রগতির প্রতীক; বিপরীতে মজিদের উপস্থিতি নির্মিত হয়েছে অন্ধকার, সংকীর্ণ ও নিয়ন্ত্রিত স্থানে, যা ভীতি ও কর্তৃত্বের সাংকেতিক রূপ। চলচ্চিত্রের সমাপ্তিতে স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতা ধর্মীয় আধিপত্য গ্রামীণ সমাজে আধুনিকতার সম্ভাবনাকে কীভাবে রুদ্ধ করে, তা নির্দেশ করে। ফলে বলা যায়, *লালসালু* চলচ্চিত্র কেবল সহজিয়া ও রক্ষণশীল ইসলামের দ্বন্দ্বেরই চিত্রায়ণ নয়, বরং আধুনিকতা ও প্রথাগততার মধ্যে চলমান সাংস্কৃতিক সংগ্রামেরও এক প্রতীকী চিত্র।

উপসংহার

তানভীর মোকাম্মেল পরিচালিত *লালসালু* (২০০১) চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে ধর্মীয় কর্তৃত্ব, আধুনিকতা ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে একটি শক্তিশালী ভিজ্যুয়াল ন্যারেটিভে রূপ দিয়েছে। এই গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, চলচ্চিত্রটি কেবল ধর্মীয় মতাদর্শের সংঘর্ষ উপস্থাপন করে না, বরং সংস্কৃতির মাধ্যমে ক্ষমতা কীভাবে নির্মিত, বিস্তৃত ও পুনর্গঠিত হয়, তার একটি সমাজতাত্ত্বিক পাঠও প্রদান করে। ফলে *লালসালু* ধর্মীয় আখ্যানের বাইরে গিয়ে গ্রামীণ বাংলার ধর্ম, সংস্কৃতি ও ক্ষমতার জটিল বাস্তবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক দলিল হয়ে ওঠে। চলচ্চিত্রে সহজিয়া ইসলাম মানবিকতা, সহিষ্ণুতা ও অন্তর্মুখী ধর্মবোধের প্রতীক হিসেবে নির্মিত হলেও রক্ষণশীল ইসলাম উপস্থাপিত হয় কর্তৃত্ব, ভয় ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাঠামো হিসেবে। এই দ্বন্দ্বমূলক নির্মাণে সহজিয়া ইসলামের লোকজ ও মানবিক সাংস্কৃতিক রূপ রক্ষণশীল ইসলামি আধিপত্যবাদের বিপরীতে একটি বিকল্প নৈতিক সত্যকে প্রস্তাব করে। এর ফলে চলচ্চিত্রটি ধর্মীয় দ্বন্দ্বের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক প্রতিস্পর্ধার একটি স্পষ্ট চিত্র হাজির করে।

স্টুয়ার্ট হলের রিপ্রেজেন্টেশন তত্ত্বের আলোকে লালসালু ধর্মীয় ক্ষমতা ও সামাজিক বাস্তবতার একটি প্রতীকী নির্মাণ হিসেবে পাঠযোগ্য। একই সঙ্গে গ্রামসির সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে, কীভাবে ধর্ম ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ জনগণের সম্মতি নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকর কাঠামো গড়ে তোলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'লালসালু' নিজেই একটি আধিপত্যবাদী প্রতীকে পরিণত হয়, যেখানে ধর্মীয় অর্থ নির্মাণের মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস ঘটে।

চলচ্চিত্রটিতে মজিদ চরিত্র ধর্মীয় আধিপত্যের মাধ্যমে মানসিক স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হলেও, আক্কাস আধুনিক শিক্ষা ও যুক্তিবাদী চেতনায় সম্ভাব্য মুক্তির পথ নির্দেশ করে। তবে, সমাজে প্রোথিত ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও রক্ষণশীল মানসিকতা সেই মুক্তির সম্ভাবনাকে অবদমিত করে। এভাবে, *লালসালু* আধুনিকতার পথে রক্ষণশীলতার বাধা ও ধর্মীয় ক্ষমতার সাংস্কৃতিক কার্যকরণকে সমালোচনামূলকভাবে উন্মোচন করার মাধ্যমে বাংলাদেশের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ক্ষমতার ইতিহাস অনুধাবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণাত্মক অবদান রাখে।

তথ্যসূত্র

আহমদ, জাহেদা। (২০০৭)। রাষ্ট্র ও শিক্ষা। '*বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ (৩য় খণ্ড)*' [সম্পা. সিরাজুল ইসলাম, পৃ: ৭২-১০৫]। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

আহমদ, ড. ওয়াকিল। (১৯৬৫)। *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*। বাংলা একাডেমি।

ওহীদ, আবু নাসের মো.। (২০১০)। রেপ্রিজেন্টেশন। মাসউদ ইমরান সম্পাদিত *'ক্রিটিক্যাল তত্ত্বচিন্তা'* (পৃ: ৩৭৮-৩৯৭)। মাওলা ব্রাদার্স।

খান, মঈনুদ্দীন আহমেদ। (২০০৭)। মুসলিম ধর্মসংস্কার আন্দোলন। *'বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ (৩য় খণ্ড)'* [সম্পা. সিরাজুল ইসলাম, পৃ: ১৩৫-১৫৩]। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

দৈনিক প্রথম আলো। (২০১৮)। সংসদে বিল পাস, কওমির স্বীকৃতি আইনি বৈধতা পেল। ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮।

নোমান, স্বকৃত। (২০২৪)। *বাংলায় ইসলাম: সহজিয়া ও রক্ষণশীল ধারা*। পাঠক সমাবেশ।

বুবুন, আবদুল্লাহ হেল। (২০২৫)। ধর্মনিরপেক্ষতাকে হত্যা করেছে হাসিনা, কফিনে শেষ পেরেক ঠুকেছে ইউনূস। *নেত্র নিউজ*। অক্টোবর ৮, ২০২৫। URL: https://netra.news/2025/hasina-killed-secularism-yunus-buried-it-bn/

ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ। (১৯৫৭)। *বাংলার বাউল ও বাউল গান*। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি।

মামুন, আ-আল। (২০১৩)। সিনেমা রেপ্রিজেন্টশন: বোমা-জঙ্গি-মাদ্রাসা-ইসলাম এবং বাংলাদেশ। *যোগাযোগ*, ১১, পৃ ১২৭-১৪৪।

রইছউদ্দিন, আ.ন.ম.। (২০১৪)। সুফিবাদ। *বাংলাপিডিয়া অনলাইন*। URL: https://bn.banglapedia.org/index.php?title=সুফিবাদ

সুলতান, টিপু। (২০১৬)। সালাফি মতাদর্শী ব্যক্তিদের নিয়ে উত্থান জেএমবি। *দৈনিক প্রথম আলো*। ৫ আগস্ট ২০১৬।

হক, ড. মুহাম্মদ এনামুল। (২০১১)। *বঙ্গে স্থূফী-প্রভাব*। র‍্যামন পাবলিশার্স।

হক, ফাহমিদুল। (২০১৭), *চলচ্চিত্র পাঠ*। আদর্শ।

হোসেন, মোহাম্মদ মোশাররফ। (২০২১)। জান্নাত (২০১৮) চলচ্চিত্র: ইসলামি সুফিবাদ ও জঙ্গিবাদের দ্বান্দ্বিক চিত্রায়ণ। *বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট জার্নাল*, ১০(১), পৃ: ৯৩-১১৪।

Artz, L. (2013). Media hegemony. In Marcel Danesi (Ed.), *Encyclopedia of media and communication (pp 336-339)*. University of Toronto Press.

Barthes, R. (1977). *Image–Music–Text*. Fontana.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101.

Dasgupta, A. (2004). Islam in Bengal: Formative period. *Social Scientist*, *32*(3/4), 30–41.

Dyer, R. (1993). *The Matter of Images: Essays on Representations*. Routledge.

Eaton, R. M. (1993). *The Rise of Islam and the Bengal Frontier (1204-1760)*. University of California Press.

Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith). International Publishers.

Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Sage.

Haq, F. & Balraj, S. (2010). The Clay Bird: Identity Construction of Bengali Muslims on the Screen. *Bangladesh Film Archive Journal*, *3*, pp. 79–86.

Haq, F (2020). National Identity and Cinematic Representation: Independent Films in Bangladesh. In Elora Halim Chowdhury and Esha Niyogi De (eds.), *South Asian Filmscapes: Transregional Encounters*. University of Washington Press.

Haq, F., & Shoesmith, Brian (2023). *Identity, Nationhood and Bangladesh Independent Cinema*. Routledge.

Hasan, M. (2011). Historical Developments of Political Islam with Reference to Bangladesh. *Journal of Asian and African Studies*. *47*(2). 155–167.

Hossain, A. (1995). *Mazar culture in Bangladesh* (Doctoral dissertation, Murdoch University).

Kellner, D. (2011). *Cultural Studies, Multiculturalism, and Media Culture*. In G. Dines & J. Humez (Eds.), *Gender, Race and Class in Media*. Sage.

Khalil, M. Ibrahim (2022). Marxist Ideology in Syed Waliullah's Tree Without Roots: The Reflection and Reaction towards the Muslims of Indian Subcontinent, *USTC Journal*, *26*(1), 55–68.

Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Sage.

Lears, T. J. (1985). The concept of cultural hegemony: Problems and possibilities. *The American Historical Review*, *90*(3), 567–593.

Mallick, A.R. (1977). *British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856)*. Bangla Academy.

Siddiqi, B. (2018). Islamic Reforms in Bangladesh. In *Becoming 'Good Muslim': The Tablighi Jamaat in the UK and Bangladesh*. Springer, Singapore, 31–47.

Rahman M. S. N. (2018). Religious and cultural syncretism in Medieval Bengal. *The NEHU Journal*, *XVI*(1), 53–77.

Raju, Z. H. (2008). Madrasa and Muslim Identity on the Screen: Nation, Islam and Bangladeshi Art Cinema in the Global Stage. In Jamal Malik (ed.) *Madrasa in South Asia: Teaching Terror?*. London: Routledge, pp. 125-141.

Zavala, M. (2022). Cultural Imperialism and Hegemony. *Working Paper No. 59*, Portland State University Economics Working Papers. 59, 1-17.